

তথ্য না থাকলেও শুধুমাত্র স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা: অনেক সময় শিশুদের মধ্যে এমন প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা স্ক্রিনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় তথ্য না দেখলেও দীর্ঘসময় ধরে সেটার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। এটা একটা মানসিক অভ্যাসে পরিণত হয় যেখানে শুধু স্ক্রিনের আলো, চলমান ছবি বা রঙিন কনটেন্টই তাদের মনোযোগ ধরে রাখে।

কম্পিউটার বা গেম আসক্তি: এটি এমন একটি ধরন যেখানে শিশু বা কিশোর-কিশোরীরা অতিরিক্ত ও বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার ব্যবহার বা ভিডিও গেম খেলে থাকে। এই আসক্তি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে এবং এটি পড়াশোনা, কাজ, সম্পর্কসহ জীবনের নানা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ইন্টারনেট কমপালশন (□□□□□□□□ □□□□□□□□□□) বা বাধ্যতামূলক অনলাইন ব্যবহার: এটি এমন এক ধরনের আচরণ যেখানে কিশোর-কিশোরীরা বারবার ও অপ্রতিরোধ্যভাবে অনলাইনে নির্দিষ্ট কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। যেমন অনলাইন নিলাম, শেয়ার মার্কেটে ট্রেডিং কিংবা জুয়ার আসক্তিতে থাকে। এই আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সাইবার সম্পর্কের আসক্তি: এই ধরনের আসক্তিতে কিশোর-কিশোরীরা ভার্চুয়াল সম্পর্ক, যেমন ডেটিং অ্যাপ, চ্যাট রুম বা ভার্চুয়াল জগতে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বে অতিরিক্তভাবে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় এই অনলাইন সম্পর্কগুলো বাস্তব জীবনের সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

মানবিক সমাজ গঠনে অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তা ও রাষ্ট্রীয় নীতি

বৈশাখের কার্যকর অর্থনীতি

স্মার্টফোন বা স্ক্রিন আসক্তি শিশুদের জীবনে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এটি চিহ্নিত করার জন্য কিছু সাধারণ ও স্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায় যে একটি শিশু অতিরিক্তভাবে ও ক্ষতিকরভাবে স্ক্রিন ব্যবহার করছে। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ও তার প্রভাব তুলে ধরা হলো—

স্মার্টফোন বা স্ক্রিন বন্ধ হলে বিরক্তি ও অস্থিরতা: যখন স্মার্টফোন বা স্ক্রিন ব্যবহারে বাধা দেওয়া হয় বা সংযোগ কেটে যায়, তখন অনেক শিশু রেগে যায়, কান্নাকাটি করে কিংবা খুবই অস্থির হয়ে ওঠে। এটি ‘উইথড্রয়াল সিম্পটম’-এর একটি বৈশিষ্ট্য, যা নেশাজনিত আচরণে দেখা যায়।

সহজেই সময়ের হিসাব ভুলে যাওয়া: শিশুরা যখন গেম খেলে, ভিডিও দেখে বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, তখন তারা এতটাই মগ্ন হয়ে যায় যে সময় কখন কেটে যায়, তা টেরই পায় না। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনের সামনে বসে থাকে, যা তাদের দৈনন্দিন রুটিনকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলে।

শারীরিক প্রভাব ও ঘুমের সমস্যা: রাতে গেম খেলা বা ভিডিও দেখা বন্ধ করতে না পারার কারণে অনেকেই দেরিতে ঘুমাতে যায়, কিংবা ঘুম ভেঙে আবার স্ক্রিনের দিকে ফিরে যায়। এতে চোখের সমস্যা (ড্রাই আই, চোখ জ্বালা করা) এবং চোখের ওপর চাপ পড়ে। এছাড়াও স্থূলতা (ওজন বেড়ে যায়), শরীর ও মস্তিষ্ক পর্যাণ্ড বিশ্রাম পায় না, যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা: শিশু-কিশোররা যখন ইন্টারনেটে অতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, তখন পড়ালেখা, হোমওয়ার্ক, ঘরের ছোট কাজ কিংবা দৈনন্দিন দায়িত্বগুলোর প্রতি আগ্রহ কমে যায়। ইন্টারনেটকেন্দ্রিক গেম, ভিডিও বা সোশ্যাল মিডিয়াই হয়ে ওঠে প্রধান আগ্রহের জায়গা। তারা নিজের কাজ ফেলে রেখে অনলাইনের জগতে ঢুকে পড়ে।

শিক্ষার মান কমে যাওয়া: পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে যায়, নম্বর কমে যায় বা কোনো কিছুতে মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হয়।

অনলাইন কার্যকলাপ লুকানো: ডিভাইস ব্যবহারে বাধা দিলে বা নিষেধ করা হলে তারা রাগ করে, অস্থির হয়ে পড়ে বা মানসিক অস্থিতি অনুভব করে। শিশুটি অনেক সময় কী দেখছে বা কতটা সময় অনলাইনে কাটাচ্ছে তা অভিভাবকদের কাছে মিথ্যা বলে বা গোপন রাখে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: ডিভাইস নিয়ে অতিরিক্ত সময় কাটানোর ফলে বাস্তব জীবনের বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কমে যায়। ধীরে ধীরে তারা নিজেরাই সামাজিক যোগাযোগ এড়িয়ে চলে। বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর আগ্রহ কমে যায়। তারা একা থাকতে চায় এবং বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলো এড়িয়ে চলে।

যারা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে, তাদের মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, সামাজিক উদ্বেগ, আগ্রাসী আচরণ, অবাধ্যতা ও বুলিং-এর প্রবণতা অনেক বেশি, এমনকি স্ক্রিন-নির্ভরতা ছেড়ে দেওয়ার দুই বছর পরেও এই প্রভাব রয়ে যায়।

ব্যবহার কমানোর ব্যর্থ চেষ্টা: নিজের ক্ষতির বিষয়টি বোঝার পরেও স্ক্রিন ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে চাইলেও তা করতে না পারা। এই উপসর্গগুলো যদি কোনো শিশুর মধ্যে দেখা যায়, তাহলে সময়মতো সচেতনতা ও সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া উচিত।

স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি অনেক সময় শিশুর বিদ্যমান মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে বা আগের থেকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। শিশুর মধ্যে মনোযোগে সমস্যা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা ও একাকিত্ব এমন বিভিন্ন ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়, যা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগবিদ্যা বিভাগ ও কলম্বিয়া নার্সিং স্কুল (□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ & □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□)-এর গবেষকরা যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন, ৫,১০০-এর বেশি কিশোর-কিশোরীর স্ক্রিন মিডিয়া ব্যবহারের ওপর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি ছিল শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ নিয়ে সবচেয়ে বড় গবেষণা।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে, তাদের মধ্যে হতাশা, উদ্বেগ, সামাজিক উদ্বেগ, আগ্রাসী আচরণ, অবাধ্যতা ও বুলিং-এর প্রবণতা অনেক বেশি, এমনকি স্ক্রিন-নির্ভরতা ছেড়ে দেওয়ার দুই বছর পরেও এই প্রভাব রয়ে যায়।

আরেকটি গবেষণায়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অধ্যাপকগণ নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেখা গেছে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী যারা বেশি সময় স্ক্রিনে কাটায়, তাদের মধ্যে ডিপ্রেশন বা উদ্বেগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ এবং তাদের অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার আওতায় এসেছে ও ওষুধ গ্রহণ করেছে।

এই গবেষণাগুলোর ফলাফল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, স্ক্রিন আসক্তি কেবল একটি অভ্যাসগত সমস্যা নয়, বরং এটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতায় শারীরিক পরিবর্তন আনতে পারে। এর মানসিক প্রভাব বাস্তব এবং স্থায়ী।

করণীয় কী?

স্ক্রিন টাইম সীমিত করা: নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিয়ম তৈরি করতে হবে, বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের জন্য। শিশুদের জন্য স্ক্রিন টাইম সীমিত করা এবং তাদের বিকল্প খেলার সুযোগ তৈরি করা। রাতের বেলা স্ক্রিন ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া (বিশেষ করে ঘুমানোর ১ ঘণ্টা আগে)।

পারিবারিক সময় বৃদ্ধি: পরিবারের সবাই মিলে স্ক্রিন ছাড়া কিছু সময় কাটানো (যেমন একসাথে খাওয়া, গল্প করা, একসাথে খেলা, ঘুরতে যাওয়ার মতো স্ক্রিনবিহীন সময় কাটানো)। শারীরিক কার্যক্রম বাড়ানো, বিভিন্ন ধরনের আনন্দদায়ক বিষয়ে অংশগ্রহণ করা, আত্মীয়স্বজনের বাসায় বেড়ানো, দূরে কোথাও প্রকৃতির কাছে ঘুরতে যাওয়া এবং সময়মতো পর্যাপ্ত ঘুমানো।

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো: বিদ্যালয় ও পরিবারে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া উচিত।

স্ক্রিন আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হলেও, এর ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। সচেতনভাবে ব্যবহার করলে এটি আশীর্বাদ, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের জন্য অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে।

শিশু কিশোরদের স্ক্রিন টাইম সীমিত করার পরও অনেকে আচরণগত বা মানসিক সমস্যায় ভুগতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কোনো মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশু বা কিশোর যখন মানসিকভাবে সংগ্রাম করছে, তখন দ্রুত সহায়তা পাওয়াই হতে পারে সুস্থতার প্রথম ধাপ।

স্মার্টফোন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশ্লেষণ

---

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 19:37

URL: <https://www.timestodaybd.com/opinion/1362138345>